Vol. 45 | No. 1 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর দর্শনচিন্তা

Volume	45
Issue	1
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আজিজুল হক
Published online	October 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v45i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i1.4
Pages	৯৮-১১৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র দর্শনচিন্তা

সৈয়দ আজিজুল হক*

পারস্য প্রতিভা[১] গ্রন্থের জন্য খ্যাত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮–১৯৭৪) বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দর্শনচর্চায় অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর *মানুষের ধর্ম্ম* (১৯৩৩) গ্রন্থটি দর্শনভাবনায় সমৃদ্ধ। এ বইয়ের প্রকাশকালে তাঁর বয়স যদিও পঁয়ত্রিশ বছর, কিন্তু এর কিছু প্রবন্ধ[২] পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর ছাত্রজীবনেই, যখন তিনি বাইশ/ তেইশ বছরের যুবকমাত্র। *পারস্য প্রতিভা'* গ্রন্থেরও কিছু প্রবন্ধ[৩] দর্শনচিন্তায় ঋদ্ধ এবং যা তাঁর একান্ত তরুণ বয়সের রচনা। আমরা জানি, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দর্শনের ছাত্র ছিলেন। তবে এটাই তাঁর দর্শনচর্চার একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। বরং এই বিশ্বজগৎ, তার সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও জীবনরহস্যকে লেখক দার্শনিকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে অনুধাবন করতে চেয়েছেন, এটাই তাঁর দর্শনচিন্তার মূল বিষয়। পরিণামে তিনি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা ভিন্নভাবে বিবেচ্য। তবে বাঙালি শিক্ষিত মুসলিম সমাজ যখন কেবল উন্মেষ পর্যায়ে, সমাজের শিক্ষিত অংশটি পরিমাণগত বিবেচনায় একেবারেই ক্ষুদ্র, গোটা সমাজের ওপর যখন অশিক্ষা কুশিক্ষা, কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডূকতার ঘন গভীর আচ্ছাদন তখন তার অশুভ বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয়, আরবীয়, পারস্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে নিজ চিন্তা ও জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার এই প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জীবন ও জগৎ ব্যাখ্যায় দার্শনিকের অনুসন্ধিৎসার বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে অনুধাবনীয়। দার্শনিকের সঙ্গে ধর্মবেত্তার একটি মৌলিক পার্থক্য হলো, দার্শনিক যুক্তির পথ অনুসরণ করেন আর ধর্মবেত্তা বেছে নেন একান্ত বিশ্বাসের পথ। অন্যদিকে যুক্তিশীলতা উভয়ের মৌলধর্ম হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীর সঙ্গেও দার্শনিকের রয়েছে পার্থক্য। বিজ্ঞানীর আরাধ্য যেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বস্তুনির্ভর গবেষণা;

* প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দার্শনিকের অনুধ্যান সেখানে বস্তুকে অতিক্রম করে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রজাতির চেতনপ্রক্রিয়ার নানা বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে অগ্রসরমান। উভয়ের আরাধনার বৈশিষ্ট্য যেমন ভিন্ন তেমনি বক্তব্য প্রকাশের ভাষাও স্বতন্ত্র। বিশ্বজগৎ, তার সৃষ্টিরহস্য, প্রকৃতিলোক ও মানবমনের সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বৈশিষ্ট্যসমূহকে অনুধাবনের জন্য দার্শনিককে একাগ্র ধ্যানে নিয়োজিত থাকতে হয়। এই ধ্যান ধর্মচর্চাকারীর ঈশ্বর-আরাধনা থেকে যেমন ভিন্ন তেমনি বিজ্ঞানীর গবেষণাগারের সাধনা থেকেও পৃথক। দার্শনিককে ধর্মবেত্তা ও বিজ্ঞানী উভয়ের থেকে সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সৃষ্টি-উৎস, প্রাকৃতিক নিয়ম, মানবের দেহ-মনের সম্পর্ক, মানুষের শুভ-অশুভ, মহৎ-অমহৎ বোধ সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর খুঁজতে হয়। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও ধর্মবেত্তার এই সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে কতটা সচেতন থেকে দর্শনচর্চা করেছেন, তাঁর দর্শনচিন্তার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি সেটা বিবেচনা করাও এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

১.১ *মানুষের ধর্ম্ম*[৪] গ্রন্থেই লেখকের দর্শনভাবনার প্রকাশ ঘটেছে সুস্পষ্ট ও সূক্ষ্মতর সংবেদনায়। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সংকলিত 'মানুষের ধর্ম্ম' প্রবন্ধটি থেকে লেখকের দর্শনচিন্তার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এ প্রবন্ধটি গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণসমূহে তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে সংকলিত হয়। এরই প্রথম প্রবন্ধ 'অনন্ত তৃষা'য় লেখক বলেন, জীবজগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারের যে-ধর্ম সক্রিয় তা মানুষের মধ্যেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। শুধু তাই নয়, লেখকের মতে, মানুষের মধ্যে আছে আরেকটি নতুন শক্তির বিকাশ, যার নাম আত্মা। অনন্তকাল ধরে মানুষের বেঁচে থাকার যে-ইচ্ছা মানুষ তা পূরণ করতে চায় আত্মার মাধ্যমে। তাই আত্মা কল্পিত হয়েছে অবিনশ্বররূপে। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে দেহের পরিসমাপ্তি ঘটলেও আত্মা বেঁচে থাকবে এবং কর্মফল ভোগ করবে। এজন্যে মানুষের কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে স্বর্গ-নরক। গ্রীসীয়, ভারতীয়, খ্রিস্টীয় ও আরবীয় জাতি-ধর্মে স্বর্গের যে-কল্পনা তার চিত্র তুলে ধরে লেখক বলেছেন, এসব কিছু কারো কাছে অলীক প্রহেলিকা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে সমগ্র মানবের অনন্তকাল বেঁচে থাকার যে-ব্যাকুলতা সে-সত্য অগ্রাহ্য করার নয়। লেখকের মতে, মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে বাস্তবকে রেখে অবাস্তব আদর্শের পেছনে– যে ছুটে চলে তার পেছনে রয়েছে আত্মপ্রসারণেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষা যা নির্দিষ্ট কোনো জাতির বিশেষত্ব নয়, সমগ্র মানবমণ্ডলীরই এক অন্তর্প্রেরণা।

এভাবে প্রকৃতি ও মানবের 'অনন্ত তৃষা'র স্বরূপ বিশ্লেষণের পর লেখক আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মা-প্রসারণকেই মানবের 'আদিম প্রেরণা' হিসেবেও চিহ্নিত করেন তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধে। নাস্তিক একে প্রকৃতির তাড়না বলতে পারেন কিন্তু, লেখকের মতে, এটি একটি উদ্দেশ্যময় প্রেরণা, যার রয়েছে সচেতন অভিব্যক্তি, যা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচালিত। মানুষ এই প্রেরণারই এক সৃষ্টি। লেখকের ভাষায় : "পানির ধর্ম্ম যেমন নিষিক্ত করা, অগ্নির ধর্ম্ম যেমন দাহন করা, মানুষের ধর্ম্ম তেমনি আপনার সত্যকার রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সসীমের গণ্ডী পার হইয়া অসীমের সহিত একাকার হওয়া।" (ব. র., পৃ ২৯৩) আসলে, লেখকের মতে, শাশ্বত সত্যের সঙ্গে একাত্মবোধেই মানবাত্মার সার্থকতা।

'জীবন ও নীতি' শীর্ষক তৃতীয় প্রবন্ধে লেখক উনিশ শতকের তিন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য মনীষীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে তাদের ইহলৌকিক আদর্শ-নির্ভর মানবকল্যাণ চিন্তার সমালোচনা করেছেন। এঁরা হলেন অগাস্ট কোঁতে(১৭৮৯-১৮৫৭), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ও হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০ -১৮৯২)। স্পেন্সার জড় প্রকৃতিকে সমষ্টি হিসেবে কল্পনা করে মানবকে তার একটি অংশ মনে করেছিলেন। তাঁর মতে, প্রকৃতির বিকাশে সহায়তা দানেই মানবজীবনের সার্থকতা। অন্যদিকে মিল সমগ্র মানবজাতিকে সমষ্টিরূপে কল্পনা করে সেই সমষ্টির সুখবৃদ্ধিকেই মানবের কর্তব্য বিবেচনা করেন। তাঁর ধারণা, সমষ্টির সুখেই ব্যক্তির সুখ এবং সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য। কোঁতে সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। বিশ্বে মানুষের চেয়ে আর কাউকেই তাঁর কাছে বড় বলে মনে হয় নি। এঁদের চিন্তায় স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকৃত না-হওয়ায় এবং প্রচলিত ধর্ম অগ্রাহ্য হওয়ায় লেখক এই তিনজনের কারো মতকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। লেখক অবশ্য এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকে বোঝান নি, বুঝিয়েছেন অন্তরের ধর্মকে যা মানবের এক শাশ্বত প্রেরণা, মানুষের জীবনের ভিত্তিমূল নিষিক্ত করে যা প্রবাহিত, যার মধ্যে রয়েছে চিরন্তন সত্যের প্রকাশ। আর স্রষ্টা বলতেও তিনি ধর্মকেন্দ্রিক ঈশ্বরকে বোঝাননি। লিও টলস্টয় (১৮২৮–১৯১০) কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩–১৯০১) মতো তিনিও মানুষের ভেতরে প্রেমের দেবতাকে জাগ্রত দেখেছেন। আক্ষেপ করেছেন এই বলে— "মানুষ কবে বুঝিবে যে স্বর্গের যিনি মালিক তিনি তাহার অন্তরেই বিরাজ করিতেছেন।" (ব. র., পৃ ৩০০)। মনে করেছেন, অন্তরের এই ঈশ্বরকে পেতে হলে সত্যকে অনুভব করা বা সত্যকে

চেনার মতো জ্ঞানের আবশ্যক। লক্ষণীয় যে, লেখক এক্ষেত্রে বিশ্বাসে স্থিত হতে বলেন নি। লেখকের ধারণা, সত্যের এই জাগরণেই জাতিগত ও ধর্মগত বিভক্তির অবসান ঘটবে এবং সমগ্র মানবজাতি সত্যযুগকে ফিরে পাবে।

এই তিনটি প্রবন্ধই শুরুতে 'মানুষের ধর্ম্ম' নামে একটি প্রবন্ধের অংশ ছিল। মানুষের ধর্ম অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক নিজেকে নাস্তিকতা ও ইহলৌকিকতার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকেই মানুষের ধর্ম মনে করেন নি। তাঁর মতে, আত্মার অমরত্ব লাভের এক চিরন্তন অনুপ্রেরণাই মানব জীবনের মূলে সর্বদা সক্রিয়, সীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করে অসীমের সঙ্গে একাকার হওয়াই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। অন্যদিকে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মসমূহে স্রষ্টার অস্তিত্ব যেভাবে কল্পিত হয়েছে সেভাবেও লেখক মানুষের ঈশ্বরের কথা ভাবেননি। তিনি এক সর্বশক্তির কল্পনা করেছেন। যাকে ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ নিজ অন্তরেই উপলব্ধি করবে, এবং সেক্ষেত্রে মানুষের জাতিগত ও প্রচলিত ধর্মগত পরিচয়ই মুখ্য হবে না। আর এভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য এক সর্বজনীন মনুষ্যধর্মের কথা তিনি কল্পনা করেছেন।

১.২ 'ধ্রুব কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক হযরত ইবরাহিমের জীবনে ধ্রুবের অনুসন্ধিৎসা থেকে শুরু করে গ্রিক ও ভারতীয় দেবতা, ভারতীয় উপনিষদ ও ষড়দর্শন গ্রিক দর্শনের নানা দিক এবং সবশেষে প্লেটোর (খ্রি. পূ. ৪২৮/৪২৭-৩৪৭) অতীন্দ্রিয় জগৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোনো সমাধানমূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। জীবন কী, জগৎ কী, মৃত্যুর পর কী আছে— এসব প্রশ্ন সব সময়ই মানুষের মনকে আলোড়িত করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যেন পার্থিব জীবনের সুখানুভূতির পরিসমাপ্তি না ঘটে সেজন্য মানুষ ভাবতে ভালোবাসে যে, মৃত্যুর পরও একটা জগৎ আছে। লেখকের এমন বিশ্লেষণের মধ্যে মুক্তদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই মুক্তচিন্তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে উপনিষদ-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যায় :

> মানুষী চিন্তা কতদূর ঊর্ধ্বে ও কতটুকু সূক্ষ্মতায় পৌঁছিতে পারে, উপনিষদ তাহা জগৎকে দেখাইয়াছে। যে নিরাকার পরাৎপর খোদার পরিচ্ছন্ন ধারণায় পৌঁছিতে পারিয়াছে, বলিয়া ইসলাম গর্বিত, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় উপনিষদ সেই মহাসত্যের সন্ধান পাইয়া জগতের দ্বারে দ্বারে তাহা শুনাইয়া গিয়াছে। (ব. র., পৃ ৩০৬)

উপনিষদ-আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন দর্শন সাংখ্যমত ও বেদান্তের সূক্ষ্ম দৃষ্টির কথাও উল্লেখ করেছেন। সাংখ্যমতে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু জড়ের বিকার, আত্মা নির্বিকার ও নিষ্কাম, জড়প্রকৃতির লীলাদর্শনে চৈতন্য বা আত্মা পুলকিত। অন্যদিকে, বেদান্ত মতে, জড় প্রকৃতি কোনো সত্তা নয়, মায়া মাত্র অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা আর আত্মা বিভক্ত নয়। তা ব্রহ্মেরই অংশ। কিন্তু লেখকের মতে, বেদান্ত নির্দেশিত ধ্রুব অনুধাবনে সাধারণ মানুষ ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তীকালে বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য লৌকিক ধর্মের সৃষ্টি হয়। অতঃপর এ প্রবন্ধে লেখক বিস্তারিতভাবে গ্রিক দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে সক্রেটিস (খ্রি. পূ. ৪৬৯-৩৯৯), পূর্বকালের দার্শনিকদের মধ্যে থেলিস (খ্রি. পূ. ৬২৪-৫৪৭), এনাক্সিমেনিস (খ্রি. পূ. ৫৮৮-৫২৫), এনাক্সগোরাস (খ্রি. পূ. ৫০০-৪২৮), এমপিডোক্লিস (খ্রিঃ পূ. ৪৮৩-৪২৩), ডিমোক্রিটাস (খ্রি. পূ. ৪৬০–৩৭০) প্রমুখের গভীর চিন্তাশ্রয়ী জড়বাদী মতামতসমূহ তুলে ধরেন। প্রকৃতির মধ্যে ধ্রুবের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে থেলিস সিদ্ধান্তে পৌঁছান, পানিই পৃথিবীর আদি শক্তিরূপী অবিনশ্বর উপাদান, জগতের মূলসত্তা। এনাক্সিমেনিসের মতে, বায়ুই জগতের মূল উপাদান, সকল জীবের প্রাণ। এমপিডোক্লিস বলেন, বিশ্বের মূল উপাদান চারটি– মাটি, পানি, আগুন ও বায়ু। এনাক্সাগোরাস-এর মতে, মূল উপাদান চারটি নয়, বহু; তারা নির্জীব। কোনো সচেতন আত্মিক শক্তি তাদের মধ্যে গতি সঞ্চার করে। ডিমোক্রিটাস দৃশ্যমান জড় অণুর সূক্ষ্মাংশরূপে পরমাণুর পরিকল্পনায় উপনীত হয়ে বলেন, পরমাণুগুলি অবিভাজ্য, অতিসূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। গতি তাদের স্বাভাবিক ধর্ম, তাদের সঞ্চালিত করার জন্য কোনো সচেতন শক্তির প্রয়োজন নেই। জড় প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে ডিমোক্রিটাসের এরূপ বিস্ময়কর অবদানের পর সক্রেটিস-প্লেটোর আবির্ভাব। সক্রেটিস সমাজে ধর্মীয় নিষ্ঠা ও নৈতিক মানোন্নয়নে প্রয়াসী হয়ে বলেন, সকল জ্ঞানচর্চারই উদ্দেশ্য মানুষের নৈতিক উন্নতি, সেজন্য মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে জাগ্রত রাখাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এভাবে জড় প্রকৃতির বিশ্লেষণের স্থলে অন্তরের দিক থেকে সত্যানুসন্ধানের ধারা সৃষ্টি হয়, যাকে তাঁর শিষ্য প্লেটো ভাববাদে আচ্ছন্ন করে ফেলেন। জগতে যত শ্রেণীর সৃষ্টি আছে প্রতিটির স্বতন্ত্র টাইপকে প্লেটো আইডিয়া বলে আখ্যায়িত করে বলেন, এই আইডিয়া মানসিক ধারণামাত্র নয়, সত্যিকারভাবে অস্তিত্বশীল একেকটি সচেতন বা অবচেতন আত্মা। আর সকল আত্মাই চিরন্তন ও ধ্রুব যার উর্ধ্বতম স্তরে রয়েছে বিশ্বআত্মা, যার প্রভাবে

সকল আত্মা সঞ্জীবিত। প্লেটোর এরূপ চিন্তাভাবনা পরবর্তীকালের ভাববাদী দার্শনিকদের হাতে আরও বিকশিত হয়েছে। জড়বাদের বিপরীতে ভাববাদকে স্থাপন করলে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহকে ভাববাদের অনুসারী বলাই সংগত। তবে এ প্রবন্ধের শেষে তিনি প্লেটোর আইডিয়ালিস্ট ধ্যানধারণার অপূর্ণতা তুলে ধরেছেন এভাবে :

> জগতে যা কিছু পাপ যা কিছু অপূর্ণতা, যা কিছু কুৎসিত, সমস্তই জড়ের উৎপাদিত বলিয়া তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই জড় কোথা হইতে আসিল, কে তার স্রষ্টা, কেন উহা এরূপে বিশ্ব-আত্মার কার্য্যে বাধা দিয়া বিদ্রোহ আনয়ন করিতেছে, এ সকল প্রশ্নের কোন পরিষ্কার সমাধান প্লেটোর দর্শনে মিলে না। আত্মা যদি ধ্রুব হয়, তবে তাহারই সহচর জড়কে কোন্ স্থান প্রদান করা হইবে?.... আত্মজিজ্ঞাসায় তাঁহার দর্শনের সূত্রপাত, তাঁহার সকল মীমাংসাই নিছক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবতার সহিত উহার সম্বন্ধ অতি অল্প। তাই আধুনিক প্রাণসর্ব্বস্ব যুগে প্লেটোর দর্শন আর তেমন সকলে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না। (ব. র., পৃ ৩১৬)

এই অপূর্ণতার মুখোমুখি হয়ে নব যুগের বিজ্ঞান-দর্শন জীবন ও জগতকে কীভাবে বিশ্লেষণ করেছে তা অনুধাবনে অগ্রসর হন লেখক।

১.৩. তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধ 'জড়বাদ'-এ লেখক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ব্যাখ্যা করেছেন। জীবন জড় ও চেতনার সমাহার, সেখানে চেতনার অবসান হলে জড় পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। এ দুয়ের মধ্যে কোনটি ধ্রুব সে-প্রশ্নে জড়বাদী জড় পরমাণুর পক্ষে, চেতনার নিত্যতায় তার সন্দেহ। চেতনা, লেখকের ভাষায়, জড়েরই 'সাময়িক বিকৃতি মাত্র'। জড় থেকে চেতনা কীভাবে সৃষ্টি হলো সে-প্রশ্নে জড়বাদী বিব্রত নন। তাদের মতে, চেতনা সর্বতোভাবে জড়েরই সাপেক্ষ। মানুষের এত যে জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, সৃষ্টিশীলতা তার উৎস হলো মস্তিষ্ক কোষ যা জড় উপাদানেই তৈরী। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক, দেখা যায়, জড়ই জীবনের ভিত্তি। বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে ভাববাদী মত খণ্ডনের পর প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক বলেন, "রূপকের মোহ ঘুচিলেই মানুষ বিস্ময়ে দেখিবে, একদিন যাহাকে সে চৈতন্য বলিয়া পূজা দিয়াছে সে জড়েরই একটা সাময়িক রূপান্তর মাত্র।" (ব. র., পৃ ৩২৫)। এ প্রবন্ধে লেখক জড়বাদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরায় লেখককে জড়বাদের সমর্থক ভাবা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এটি যে লেখকের সাময়িক অবস্থান তা অন্য প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলেই অনুধাবন করা যায়।

'বস্তুরূপ ও বস্তু' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকের অনেক বক্তব্যই বিজ্ঞানসম্মত; যেমন, স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াসংক্রান্ত ব্যাখ্যা। কিন্তু লেখক এ প্রবন্ধে বিজ্ঞানের যুক্তিতে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারেন নি। স্নায়ুতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে মানুষকে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে এই বিজ্ঞানব্যাখ্যায় লেখক সন্তুষ্ট নন। তিনি বস্তু ও স্নায়ুতন্ত্রের মাঝে মন নামক একটি চৈতন্যপ্রক্রিয়ার কল্পনা করেন এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রের বস্তুজগৎ-সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার সীমাদ্ধতা তুলে ধরেন। বলেন, মন স্নায়ুতন্ত্রের প্রাচীর ভেঙে সরাসরি বস্তুকে জানতে পারে না। সুতরাং লেখকের মতে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানলাভের মধ্যে রয়েছে বিরাট অসম্পূর্ণতা। এই অসম্পূর্ণতার উপলব্ধি থেকেই লেখকের প্রশ্ন: যে-মানুষ নিজের জৈবদেহের মধ্যে কী ঘটছে সেটাই ভালোভাবে জানে না মহাবিশ্বের আদি স্বরূপ তার পক্ষে উদ্‌ঘাটন করা কীভাবে সম্ভব? অতঃপর প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক দর্শনের যুক্তিশীলতাকে অগ্রাহ্য করে অধ্যাত্মবাদে আশ্রয় নিয়ে তাদেরকেই ভাগ্যবান মহামানব বলেন, যারা সকল ইন্দ্রিয়পথ রুদ্ধ করে জাগতিক অনুভূতিসমূহের ঊর্ধ্বে উঠে পরম সত্তার সন্ধান পেয়েছেন। লেখকের এই ব্যাখ্যায় স্পষ্টতই বিজ্ঞানীরা মহামানবের পর্যায়ভুক্ত নন।

১.৪. 'চৈতন্যবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকের ভাববাদী অবস্থান আরও দৃঢ় এবং জড়বাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক। লেখকের মতে, জড়বাদ বস্তুজগৎকে বিশ্লেষণ করলেও মনোজগৎ বলে এছাড়াও যে একটি রাজ্য আছে সে-সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছাতে পারে নি। এ প্রবন্ধে লেখক জড়বাদের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি তুলে ধরেছেন তাকে ঠিক উন্নত দার্শনিক প্রজ্ঞামণ্ডিত বলা যাবে না। বলেছেন, জড়বাদী যে বস্তুজগৎকে বিশ্লেষণ করছে তাও চৈতন্যেরই সাহায্যে। লেখকের ভাষায় : "মানুষকে চেতনা হইতে বঞ্চিত কর, ডিনামাইট ও সাবমেরিন আর গঠিত হইবে না।... ... জড়বাদী হয়ত বলিবেন, জ্ঞানের দেউটী নিভিল- তো কি হইল!' (ব. র., পৃ ৩৩৮)। জড়বাদী সম্পর্কে লেখকের এ উক্তি একান্তই তাঁর মনগড়া । বস্তুবাদীরা কখনও এ-ধরনের কথা বলে না। স্পষ্টতই যুক্তিজয়ের এক সহজ কৌশল লেখক এখানে গ্রহণ করেছেন। সৃষ্টিজগতে এক থেকে বহুত্বের বিকাশ ঘটল কীভাবে– দর্শনের এই জটিলতম প্রশ্নের মীমাংসায় লেখক বেদান্ত এবং প্লেটো ও লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬)-এর বক্তব্য বিশ্লেষণের পর মন্তব্য করেছেন, সৃষ্টির আদি স্তরে অভিন্ন পদার্থের ক্রমান্বয়ে বহুত্বে বিভাজন ও জড়ে প্রাণ সঞ্চারণের

ঘটনাটি বৈজ্ঞানিকের কাছে চিরকালের অজ্ঞাত বিষয়। এক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদীর মতকেই তিনি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে বলেছেন : জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বহু বিভক্ত বৈচিত্র্য মূলত সৃষ্টিধর্মী চৈতন্যেরই বহুমুখী প্রকাশ। বহুত্বের মূলে রয়েছে একই উদ্দেশ্যের যোগসূত্র। আর এভাবে তিনি ভাববাদী দর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। শুধু তাই নয় এ-অবস্থানেও তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির থাকেন না, আরও নেমে গিয়ে প্রশ্ন করেন : "জড়বাদী যাহাকে জড়পদার্থ বা জড়শক্তি বলিয়া পরিকল্পনা করিতেছেন তাহা যে কোনও জীবন্ত শক্তির বাহ্য প্রকাশ নহে তাহাই বা কে বলিল? ... ... ইট পাথর বা সোনা রূপার ভিতরেও যে চেতনা আড়ষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে না তাহা কে বলিতে পারে।" (ব. র., পৃ ৩৪২)। এভাবে লেখক নিজের অজান্তেই দর্শনের যুক্তিবাদী অবস্থান থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে আশ্রয় নেন যুক্তিহীন এক বিশ্বাসের জগতে।

অতঃপর 'জীবনপ্রবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক অতীন্দ্রিয় জগতের মহিমা প্রচারেই তাঁর সকল প্রয়াস নিয়োজিত করেছেন। প্রথমেই তিনি ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গসেঁর (১৮৫৯-১৯৪১) বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছেন, আমাদের ক্ষুদ্র দেহ পরিসরে প্রাণশক্তির যে-অনুভব তা বিশ্বজনীন চিরন্তন আত্মিক জীবনেরই অংশ। জড় ও চেতনার মূলসত্তা এক, তাই তা একই অখণ্ড জীবনপ্রবাহের দুটি দিকমাত্র। চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)কে লেখক 'জড়বাদী পণ্ডিত' বলে কটাক্ষ করে বলেছেন, বিবর্তন কী 'প্রকারে' হয় ডারউইন তা বলেছেন কিন্তু কেন হয় এবং বীজকোষে বিভাগস্পৃহা কোত্থেকে আসে তা ব্যাখ্যা করেন নি। এ-বিষয়ে বার্গসেঁর ব্যাখ্যাকে লেখক শিরোধার্য মনে করেছেন, অর্থাৎ এই বিভাগস্পৃহা শাশ্বত জীবনপ্রবাহের আপন স্বভাব-অন্তর্গত। বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কার ছাড়া মানুষের জীবনে সক্রিয় রয়েছে যে অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি তা, লেখকের মতে, দেশকাল-সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাইরের বস্তু। তিনি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পাশাপাশি এ-প্রবন্ধে পরমাণুর ভেতরের রহস্যজগৎ ব্যাখ্যাসহ নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানের অক্ষমতাও তুলে ধরেন। এসব কিছুরই লক্ষ্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে প্রাধান্য দান। আর এভাবে লেখক বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তিসম্মত অবস্থানের বিপরীতে গিয়ে নিজেকে দাঁড় করান। এবং কখনও কখনও অধ্যাত্মবাদের চোরাবালিতে মুখ গুঁজেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই লেখকের যুক্তিহীন অধ্যাত্মচেতনার স্বরূপ উন্মোচিত হবে :

১. প্রবাসী পুত্রের বিপদপাতে সুদূর গৃহে বসিয়াই জননী তাহার ব্যথা অনুভব করেন, ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বামী বিপদাপন্ন হইলে সাধ্বী স্ত্রীও তাহা দূর হইতে বুঝিতে পারে। এই অনুভবশক্তি অনুশীলন দ্বারা এতই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে যে, সাধু পুরুষেরা গৃহে বসিয়া সমগ্র বিশ্বের কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা বলিয়া দিতে পারেন। (ব.র.পৃ ৩৫৭)

২. স্বপ্নের ভিতরও অনেক সময় গায়েবী, অজানা খবর লাভ করা যায়। দুইটি লোক একই স্বপ্ন দেখিয়াছে, ইহাও অনেক সময় দেখা যায়। (ব. র পৃ ৩৫৭)

৩. দেশ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ জীব আমরা, আমাদের এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বাহ্য জগৎকে বুঝিতে পারি; কিন্তু তার অতীত আরও কোনো সন্ধান পাইতে হইলে ঐ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালা ভিন্ন বোধ হয় অন্য গতি নাই। (ব. র., পৃ ৩৫৭)

৪. প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধকদের পক্ষে দুই একটি ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারা বা গৃহে বসিয়া বাহিরে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা বলিতে পারা, অতি নিম্নস্তরের সাফল্য। যাঁহারা আত্মিক সাধনায় বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের মনশ্চক্ষু এমনভাবে খুলিয়া যায় যে তাঁহাদের নিকট সকল কাল বর্তমানে পরিণত হয়, সকল দেশ সম্মুখীন মনে হয়, সকল পদার্থ স্বচ্ছ হইয়া আসে। পাঠক বুঝিতেছেন, এই মনশ্চক্ষুই অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি। (ব. র., পৃ ৩৬২)

লেখকের জীবনব্যাখ্যা এ-প্রবন্ধে কোন ধরনের অতিলৌকিক বিশ্বাসের জগতে ঘুরপাক খাচ্ছে তা এসব বক্তব্য থেকে স্পষ্ট।

১.৫. এভাবে লেখক ক্রমশ মুক্তবুদ্ধির প্রেরণা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর, বিশেষত পঞ্চাশের দশকে লেখা তাঁর তিনটি প্রবন্ধে এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট। প্রবন্ধ তিনটির শিরোনাম : 'পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ', 'বিজ্ঞান-যুগে ধর্ম ও সভ্যতা' এবং পারমার্থিক জগৎ ও জীবন।' এর প্রথম প্রবন্ধে লেখক এমন ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করেন যাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক চুম্বক, কম্পাস, ইথার প্রভৃতির কার্যক্রমকে রহস্যময় ও মানুষের জ্ঞান-বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করে বলেন, জড়ের ভেতরে কীভাবে প্রাণের উন্মেষ হলো সে-প্রশ্ন রহস্যাবৃতই থেকে যাচ্ছে এবং এসব অনুদ্ঘাটিত রহস্যরাজি বিশ্বের চরম সত্তার অন্বেষণে জড়বিজ্ঞানের ব্যর্থতার পরিচয় তুলে ধরছে। লেখক কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-উৎস ছাড়াই জেমস জীনস (১৮৭৭-১৯৪৬), আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯–১৯৫৫), আর্থার এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪) প্রমুখ মনীষীর একটি বক্তব্য তুলে ধরেন, যাতে বলা হয়েছে : অত্যাধুনিক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কারসমূহের ফলে জড়জগতের পেছনে সক্রিয় যে বিরাট চেতনাশক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই বিশ্ব হয়ত বস্তুরূপে তারই মূর্ত প্রকাশ। এভাবে লেখক বিজ্ঞানীর সামগ্রিক আবিষ্কারকে গভীরভাবে বিবেচনায় না নিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন বক্তব্য তুলে ধরে মূলত চৈতন্যবাদে আশ্রয় খোঁজেন।

'বিজ্ঞান-যুগে ধর্ম ও সভ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাকাশ, মহাবিশ্ব এবং পরমাণু সম্পর্কে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ ব্যাখ্যা করে দেখান, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের এক স্বাভাবিক বিরোধ উপস্থিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত মহাকাশে বেহেশত দোজখের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে-কার্যকারণের অমোঘ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে বিজ্ঞান মনে করে তার সঙ্গেও ঈশ্বরের শক্তি-কল্পনার বিরোধ সুস্পষ্ট। লেখকের মতে, বিজ্ঞানের দ্বারা এ-যুগের আলোকিত মানুষের পক্ষে পরলোকে বিশ্বাস স্থির রাখা প্রায় অসম্ভব। এছাড়া কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) প্রণীত দর্শনতত্ত্ব ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধারণায় প্রচলিত ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে তাও লেখকের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। নাস্তিক্য প্রচার করায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ লেখকের কাছে বিপজ্জনক ও পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ধনবণ্টনে সাম্য স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় ওই সমাজে তা ভোগবাদিতার প্রসার ঘটিয়ে আত্মিক দৈন্য প্রকট করেছে বলে লেখক যে-মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ নয়। লেখক সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক উভয় সমাজকে ভোগবাদী ও নীতিহীন বলেছেন; লেখকের মতে, যা মানব সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনবে। এজন্যে তিনি যন্ত্রযুগের সভ্যতাকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, এ দুই ধরনের সমাজ যন্ত্রসভ্যতারই ফল। ধর্মীয় আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ায় লেখক সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানবকল্যাণধর্মিতাকে অনুধাবন করতে পারেন নি। নৈতিক শিক্ষা ও সত্যিকার ধর্মের পুনরুজ্জীবনকেই লেখক এ থেকে উত্তরণের প্রকৃত উপায় বলে মনে করেছেন। পাশ্চাত্যের জড়বাদী ভোগবাদী সভ্যতার বিপরীতে প্রাচ্যের ত্যাগধর্মী আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনই এ অবস্থায় লেখকের কাম্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর বিভিন্ন আলোচনায় পাশ্চাত্যের বস্তুসাধনা ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মসাধনার কথা তুলে ধরে বলেছেন, এ দুয়ের একটি সুসমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনার্থই মানুষকে দিতে পারে প্রকৃত শক্তি বা পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের এ সামঞ্জস্য চেতনাই যথার্থ। কিন্তু লেখক এর একটিকে বাতিল করে দিয়ে, বলা যায়, খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ফলে লেখকের এরূপ বিশ্লেষণ ও

সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া যে-দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিভেদ রেখা অঙ্কন করেছেন সেটিও প্রশ্নসাপেক্ষ। লেখক যন্ত্রসভ্যতাকে ধর্মের বিপরীতে স্থাপন করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, যন্ত্রসভ্যতা, বিজ্ঞান ও মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশে প্রচলিত ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ফলেই কি মানবসভ্যতার বর্তমান নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে? এই সংকট সৃষ্টিতে প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের কি কোনো ভূমিকা নেই? লেখক সত্যিকার ধর্মের পুনরুজ্জীবন চেয়েছেন কিন্তু এই সত্যিকার ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নি। প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে এর আত্মীয়তা-অনাত্মীয়তার বিষয়টিও বিশ্লেষিত হয় নি। আর সত্যিকার ধর্ম কি প্রাচ্যেরই একান্ত নিজস্ব ব্যাপার? ধর্মতন্ত্র কি প্রাচ্যকে গ্রাস করে নি কিংবা ভোগবাদিতা? লেখক এক্ষেত্রে সত্যিকার ধর্ম বলতে প্রকারান্তরে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকেই বুঝিয়েছেন, কেননা প্রাচ্যেই এর উদ্ভব ঘটেছে।

'পারমার্থিক জগৎ ও জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলেন : "এমন দিন বেশী দূরে নয় যখন বিজ্ঞানীরা আল্লা'র সম্পর্কে আরও নিবিড়তর জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন এবং অকুণ্ঠ চিত্তে তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিবেন।" (ব. র., পৃ ৩৭৭)। লেখকের মতে, বিশ্বমনের সঙ্গে মানবমনের নিবিড় যোগাযোগের ফলে মহাপুরুষদের দৃষ্টি এমন অন্তর্ভেদী, তার মনশ্চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই অনেক কিছু দেখতে ও জানতে পারে। নাম ভিন্ন হলেও সব ধর্মেই বিশ্বআত্মা ও মানবাত্মার অবিনশ্বরত্বের স্বীকৃতি আছে– একথা বলে লেখক মনের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক দেখতে পান। আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে, আজও তা নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নি। কিন্তু বলেন, আত্মাই জীবনের মূল উৎস এবং আত্মা থেকেই আসে মানুষের সকল কর্মপ্রেরণা। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে লেখক পারলৌকিক জীবনে দেহসহ আত্মার পুনরাবির্ভাব ও কর্মফল ভোগের বিষয়ে আস্থাশীল। তিনি পাশ্চাত্যের 'প্লানচেট', হিন্দু যোগশাস্ত্রের 'প্রাণায়াম' এবং মুসলিম সাধকদের 'মোরাকাবা' প্রভৃতি আত্মা-দর্শনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা তুলে ধরেও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন। এ প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থলেই লেখক দর্শনের যুক্তির পথে স্থির থাকতে পারেন নি এবং প্রায়শ ধর্মের মৌল বিশ্বাসের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে পারমার্থিক জীবনের সন্ধান করেছেন। 'মানুষের ধর্ম্ম' প্রবন্ধে মানুষের আত্মা কল্পনার মধ্যে মানুষের অনন্তকাল বেঁচে-থাকার ইচ্ছার কথা লেখক বলেছেন। লেখকের ওই রূপ চিন্তার মধ্যে দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। এ প্রবন্ধে লেখক প্রচলিত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আত্মার কথা বলেছেন।

ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে যে-পার্থক্যের কথা লেখক নিজেই *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থে ইবনে সিনার (৯৮০–১০৩৬) জীবন বোধ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন সে-বিষয়টি *মানুষের ধর্ম* গ্রন্থের উপসংহারে এসে নিজেই যেন বিস্মৃত হয়েছেন। লেখক নিজেই বলেছেন, ইসলামের সূচনাপর্বে মুসলিম দার্শনিকদের কাছে ধর্মের ব্যাখ্যা দানই ছিল প্রধান কর্তব্য। কিন্তু ইবনে সিনা ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে বলেন, ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস আর দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি-বুদ্ধি। দর্শনের কাজ হচ্ছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ ও জীবনের নিগূঢ় সমস্যাবলির বিশ্লেষণ ও সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা; অন্যদিকে ধর্মের কাজ হলো, মনুষ্য বুদ্ধির অতীত ও অজ্ঞেয় নানা মৌলিক সূত্রকে ভিত্তি করে মানুষের মনকে এক অজানা রহস্যমণ্ডিত জগতের দিকে আকৃষ্ট করা। সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষের ধর্ম গ্রন্থে লেখক শুরুতে দর্শন আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তবে মাঝে মাঝে তিনি যুক্তিবুদ্ধির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং কখনও কখনও ধর্মীয় বিশ্বাসে স্থিত হয়েছেন। আবার কখনও কখনও ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করেছেন। প্রাবন্ধিক আবদুল হক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর দর্শনচিন্তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অন্তত পাঁচবার লেখকের এই বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১. সাধারণভাবে দর্শন-আলোচনার মাঝখানে এরূপ বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাসের অবতারণা সঙ্গত হয়েছে বলা কঠিন, কেননা দর্শনের যুক্তি নিয়ে তর্ক চলে, ধর্মবিশ্বাস নিয়ে চলে না।[৬]

২. পদার্থবিজ্ঞানীরা কিন্তু এমন কথা বলেন না, এবং বিজ্ঞানকে লঙ্ঘন করে দর্শন দাঁড়াতে পারে কেমন ক'রে বোঝা কঠিন।[৭]

৩. এরূপ উক্তি শুধু অদার্শনিক নয়, এটা কোনো যুক্তিই নয়। এরূপ উক্তির ফলে বরকতুল্লাহ সাহেবের চৈতন্যবাদ ধূলিস্যাৎ হয়েছে।[৮]

৪. দর্শনালোচনা আরম্ভ করে এইভাবে তিনি কার্যতঃ দর্শনকে বর্জন করেছেন কেননা দর্শনের প্রধান কথা যুক্তি-প্রমাণ।[৯]

৫. লেখক হিসাবে রহস্যবাদের বাইরে দর্শনের আর কোনো চর্চাই তিনি করেন নি।[১০]

আবদুল হক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহকে দার্শনিক বিচারে 'অদ্বৈতবাদী, চৈতন্যবাদী, অজ্ঞেয়বাদী এবং মরমিয়াবাদী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আব্দুল হকের উপরিউক্ত মূল্যায়ন ও এই আখ্যাদান যথার্থ। তবে এ-প্রসঙ্গে দর্শনবিদ আমিনুল ইসলাম কিছুটা

ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, "চিন্তার ক্ষেত্রে বরকতুল্লাহ 'মরমিয়াবাদী' আব্দুল হকের একথা মেনে নিলেও তিনি বিজ্ঞানবিরোধী ছিলেন একথা বলা যায় না। কারণ বরকতুল্লাহ বিজ্ঞানকে বিসর্জন দেননি, বিজ্ঞানের প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন অকপটে।"[১১] আমিনুল ইসলাম তাঁর 'মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর দার্শনিক চিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধে অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, "বরকতুল্লাহ 'বিশ্বময় প্রেরণা' সনাতন সত্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাঁর ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় সুস্পষ্ট, এবং একই সঙ্গে তাতে আবার অভিব্যক্ত হয়েছে প্রচলিত ধর্মানুভূতি ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁর আবার প্রগাঢ় আস্থা।"[১২] তবে একই প্রবন্ধে তিনি একথাও বলেছেন যে, "ধর্মভাবাপন্ন মানসিকতা তাঁকে বিজ্ঞানবিমুখ কিংবা প্রগতি বিরোধী করে নি, করতে পারে নি।"[১৩]

২. *মানুষের ধর্ম* গ্রন্থের বাইরে *পারস্য প্রতিভায়* লেখক বাহাত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ ভূমিকায় এবং ইবনে সিনা ও আল গাযযালির (১০৫৮-১১১১) জীবনদর্শন আলোচনায় পারস্যকে কেন্দ্র করে দশম-ত্রয়োদশ শতাব্দে যে দর্শনচর্চা বিকাশ লাভ করেছিলো তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। দামেস্ক ও বাগদাদের বৈদেশিক শাসন অবসানের পর স্বাধীন পারস্যে নবজীবনের সূত্রপাত ঘটায় এই দর্শনচর্চা বিকাশের এক অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ-সময়ে পারস্যের মনীষীদের চিন্তাভাবনায় প্রভাব বিস্তার করে আরবের যুক্তিবাদী দর্শন শিক্ষা, ভারতীয় উপনিষদের বাণী, গ্রিস ও মিসরের নিও প্লেটনিক ভাবধারা, মরমী সুফীবাদের ধ্যানমগ্নতা প্রভৃতি। লেখক এই আলোচনাকে আরও অতীতে টেনে নিয়ে গেছেন এবং এর উৎস খুঁজেছেন অষ্টম শতাব্দে সিরিয়ায় উদ্ভূত মুতাঝিলা দর্শনের সূত্রপাতের মধ্যে। অদৃষ্টবাদ-সম্পর্কিত বিতর্কে শাস্ত্রপন্থীদের বিরুদ্ধবাদী হিসেবে মুতাঝিলাদের উদ্ভব ঘটে। মুতাঝিলাগণ মানুষের কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং মানুষের কর্মকে নিয়তির অধীন বলে মানতেন না। তারা প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) দর্শন এবং কুরআন উভয়কে অভ্রান্ত বলে মান্য করে এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পান। নবম শতাব্দে আব্বাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে মুতাঝিলা দর্শন ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়। তারা আল্লাহর সর্বময় একত্ববাদ, তার অখণ্ডনীয় সত্তা প্রভৃতির পাশাপাশি কুরআনের চিরন্তনত্ব নিয়েও প্রচলিত মতের বাইরে যুক্তি উত্থাপন করলে তা আরব-পারস্যে বিস্ময়কর প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

মুক্তবুদ্ধির বিকাশে অবদান রাখার জন্য মুসলিম রেনেসাঁর যথার্থ প্রতীক হিসেবে যেসব মনীষীর নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন : আল্ কিন্দি (৮০০-৮৭০), আল ফারাবি (৮৭৩-৯৫০), ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৬), ওমর খাইয়াম (১০৭৫-১১২৪), ইবনে রাজা (মৃ. ১১৩৪), ইবনে তোফায়েল (১১০০-১১৮৫), ইবনে রুশদ (১১২৬–১১৯৯) প্রমুখ। স্মরণীয় যে, অ্যারিস্টটলের দর্শন অনেকটা বিজ্ঞানভিত্তিক, তা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের পুরোপুরি সমর্থক নয়। তবে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি দৃশ্যমান বাস্তব জগৎকে প্লেটোর মতো অলীক বলেন নি। তাঁর মতে, এ জড়জগৎ সত্য। আর জড়ত্ববিহীন এক অশরীরী নির্মল আত্মা স্বীয় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা একে সৃষ্টি করেছে, যে-আত্মা ইচ্ছাময় এবং এই ইচ্ছাই তার শক্তি। এই দর্শন একাধারে আরব-পারস্যের বুদ্ধির মুক্তির সংগ্রামে সহায়ক হয়েছিল। আবার পরলোকের অস্তিত্ব ও মানুষের কর্মফল ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে আস্থাহীন করে তুলেছিল। লেখকের মতে, ইবনে সিনা এই দর্শনের গরল বাদ দিয়ে শুধু সুধা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি, ইবনে সিনা ধর্ম ও দর্শনকে পৃথক করে দেখতেন এবং এ দুয়ের সমন্বয়কে অসম্ভব মনে করতেন। ইবনে সিনা দর্শনকে লজিক, বস্তুবিজ্ঞান (ফিজিক্স) ও আদিদর্শন (মেটাফিজিক্স) এরূপ শাখায় বিভক্ত করে বলেন, পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় মেটাফিজিক্সে। তাঁর মতে, মন আত্মারই সক্রিয় প্রকাশ, এর সঙ্গে দেহের কোনো যোগাযোগ নেই। আত্মা জড় মস্তিষ্কের সাহায্যে কার্যকর। মানবাত্মাগুলি বিশ্বআত্মার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে, দেহের পরিসমাপ্তিতে মানবাত্মা বিশ্বআত্মার সন্নিধানে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকে।

ইবনে সিনার মতো ইবনে রুশদও অ্যারিস্টটলের দর্শনের ওপর গবেষণা করে তা আয়ত্ত করেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞান বা দর্শন ধর্মশাস্ত্রের এলাকাভুক্ত নয়, কারণ সকল ধর্মেরই ভিত্তি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবু তিনি দর্শনের মধ্য দিয়ে কোনো সমীচীন ধর্মে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর অধ্যবসায় নিয়োজিত করেন এবং বলেন, সৃষ্টিরহস্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গমের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দর্শনের অধ্যয়ন অপরিহার্য। ১০৯৯ থেকে ১২৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দুশো বছরের ক্রুসেডের প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি দার্শনিকদের মধ্যে এক সার্বজনীন ধর্মমতের প্রসার ঘটে। এই ধর্মমতের প্রবক্তারা বলেন, সকল পরস্পর-বিরোধী ধর্মের অন্তরালেই রয়েছে এক মহাসত্যের বহিঃপ্রকাশ। ধর্মের বাহ্যিক সীমা ভেঙে দিলেই এক বিশ্বজনীন সত্যে

উপনীত হওয়া যায়। এক্ষেত্রে ইবনে রুশদ-এর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, সকল ধর্মেরই রয়েছে দুটি অঙ্গ—সত্য ও রূপ। সত্য ধর্মের প্রাণ আর রূপ তার দেহ। রূপের ভেতর দিয়ে সত্য প্রকাশিত হয়। সত্য সকল ধর্মে এক, বিরোধ শুধু রূপ নিয়ে। তিনি ধর্মের এই সত্যকে মাথার মানিক করে তুলে নিতে বলেন। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহও ইবনে রুশদ-এর এ-মতের সমর্থক হয়ে ধর্মের সত্য অনুসন্ধানকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে তিনি আরও মুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দেন, যখন বলেন : পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মের বিভিন্ন রূপের দিকে দার্শনিকের নিরপেক্ষ সংস্কারহীন দৃষ্টিতে তাকালে এর একটিকে অপরটির থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে নাও হতে পারে। (দ্র. ব. র. পৃ ৩১)

ইসলামি পরিমণ্ডলের এই শাস্ত্র-বিরোধী বিচিত্র চিন্তাধারা পারস্যের অবতারবাদ ও একত্ববাদ-সংক্রান্ত ইসলাম-বহির্ভূত প্রেরণার সংস্রবে এসে সুফিমতের জন্ম দেয়। এর ঐতিহ্যগত কারণ, লেখকের মতে, আরবেরা সেমেটিক সম্প্রদায়ভুক্ত যার প্রবণতা বহির্মুখীন, আর পারস্যবাসীরা আর্যসম্প্রদায়ভুক্ত যাদের চিন্তাধারা অন্তর্মুখীন; আরবেরা প্রত্যক্ষবাদী আর পারস্যবাসীরা ভাববাদী; সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে আরবেরা দ্বৈতবাদী, পারস্যবাসীরা একত্ববাদী। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ কল্পনা সুফি মতবাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ। সুফি মতাদর্শ প্রথমে ইসলামের স্বীকৃতি পায় নি। আল্ গাযযালি সুফি মতবাদকে যুক্তিসহযোগে স্বীকৃতি দেওয়ার পর তা ইসলামের সৌষ্ঠবে পরিণত হয়। তিনি নিজে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও ধর্মের ব্যাপারে দর্শনের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। চিন্তাধারার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের পক্ষে দর্শনের উপযোগিতার কথা স্বীকার করেও তিনি দর্শনকে ধর্মের নিচে স্থান দেন। তিনি শরিয়ত ও মারেফতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সুফীমতকে ইসলামের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁর যুক্তি হলো, হযরত মুহাম্মদ (স) যেহেতু শরিয়তি ইসলামের প্রবর্তক এবং তিনিই আবার সকল পীরের আদি পীর সুতরাং তাঁর প্রবর্তিত শরিয়তি বিধান— যার উৎস কুরআন— তা সকলের জন্য পালনীয়। সেজন্য সুফিমতের সমর্থকদের শরিয়তের ওপর নিষ্ঠাবান থাকতে হবে এবং সংসার ধর্ম পালন করতে হবে। তারা প্রকাশ্যে হবে সংসারী, কিন্তু অন্তরে হবে ফকির। লেখক এ-প্রসঙ্গে সুফিমতের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, বেদান্ত, উপনিষদ, নিও প্লেটনিজম, শঙ্কর ও রামানুজের মতাদর্শ প্রভৃতির নৈকট্য ও দূরত্ব সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেন। এসব আলোচনায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও সংস্কারমুক্ত। কুরআনের একটি অংশ ব্যাখ্যা করে লেখক বলেন, "আল্লাহ্'ই সকল কার্যের কর্তা (ফায়েল মৎলক) এবং মানুষ তাঁহার হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র। ..... কুরআনের এই শিক্ষা ও ঋষি

বদরায়ণের উপনিষদের ব্রহ্মসূত্রের ভিতর কি সুন্দর ঐক্য রহিয়াছে। ব্রহ্মসূত্র যেমন গৌড়পাদ ও শঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছিল, কুরআনও তেমনি রুমী, জা'মী ও হাফিযের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল।" (ব. র., পৃ ৪৭) *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি শিয়া মুসলিমদের ইসমাইলি মত ও তার ক্রমবিবর্তন নিয়েও আলোচনা করেছেন।

পারস্য প্রতিভা গ্রন্থে লেখক আরব ও পারস্যের ইসলামি দার্শনিকদের মধ্যে যে-চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছিল। তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রেই তাঁকে প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তাধারা, নিও প্লেটনিজম, ইবনে রুশদের দর্শনভাবনা, ভারতবর্ষের উপনিষদ, বেদান্ত, বৈষ্ণবধর্ম, শঙ্কর-রামানুজ প্রমুখের দর্শন ও ধর্মচিন্তাকেও তুলনামূলক আলোচনায় নিয়ে আসতে হয়েছে। ফলে লেখকের দর্শন-সম্পর্কিত জ্ঞানের যেমন বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাঁর উদার ও সংস্কারমুক্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর ভাববাদী, অধ্যাত্মবাদী ও মরমিয়াবাদী চেতনার স্বরূপ।

৩. লেখক ইবনে সিনার মতোই মনে করেন, মেটাফিজিক্স থেকেই মানুষের পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়। মন আত্মারই সক্রিয় প্রকাশ, দেহের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদে মানবাত্মা বিশ্বআত্মার সন্নিধানে গিয়ে স্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করে। আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য সুফিবাদের যে ত্যাগধর্মী ধ্যানমগ্ন অধ্যাত্মসাধনা লেখক তার মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রকৃত মুক্তির সন্ধান পান। অন্যদিকে তিনি ইবনে রুশদ-এর সার্বজনীন ধর্মমতেরও সমর্থক যেখানে মুক্তবুদ্ধির অনুপ্রেরণায় ধর্মীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে বলা হয়েছে, সত্য সকল ধর্মেই এক, বিরোধ শুধু রূপ নিয়ে। কিন্তু মানবতার সাধনা ওই সত্যেরই সাধনা। লেখক তাঁর দর্শন-আলোচনায় এই মানবতার সাধনার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখক দর্শনের যুক্তিশীল পথ থেকে বিচ্যুত হলেও আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ে লেখক মূলত দর্শনের আলোকেই জীবন জগৎ ও সৃষ্টিরহস্যকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথমে দর্শনচর্চা করেছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নয়। তিনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের গণ্ডি অতিক্রম করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন আত্মস্থ করার মাধ্যমে মহাজাগতিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। তবে স্বীকার্য যে, বিশ শতকের বিশ-ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে তিনি যে মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুক্তবুদ্ধি

চর্চার অংশীদার হয়েছেন, পঞ্চাশের দশকে এসে তা অব্যাহত থাকে নি। তাঁর পরবর্তীকালের গ্রন্থ-তালিকার[১৪] দিকে তাকালেই তা অনুধাবন করা যায়। অথচ মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্য লেখক, যেমন : কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) প্রমুখের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে একই ধারায় অগ্রসর হয়েছে। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর সামগ্রিক জীবনদর্শন মূল্যায়নের জন্য তাঁর শেষ জীবনের রচনাপঞ্জির দিকে দৃষ্টি ফেরানো আবশ্যক নিঃসন্দেহে, কিন্তু *পারস্য প্রতিভা*, *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর যে দর্শনচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে তার মর্মার্থ অনুধাবনই এ প্রবন্ধে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড বের হয় ১৯২৪ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩২ সালে। ১৯৬৪ সালে এই দুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়। এই অখণ্ড সংস্করণের আগে প্রথম খণ্ডের পাঁচটি এবং দ্বিতীয় খণ্ডের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ-কারণে অখণ্ড সংস্করণকে ষষ্ঠ সংস্করণ বলা হয়েছে। সম্মিলিত সংস্করণে কোনো খণ্ড বিভাগ নেই, তবে গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে কিছু কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং বিষয়বিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। দ্র. *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ ৩৯৭

২. 'মানুষের ধর্ম্ম' প্রবন্ধটি (পরবর্তীকালে তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে সংকলিত— 'অনন্ত তৃষা', 'আদিম প্রেরণা' এবং জীবন ও নীতি') 'নূর' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি ১৯২০) এবং 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় (আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৭) প্রকাশিত হয়। 'ধ্রুব কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছাপা হয় 'সওগাত'-এ ধারাবাহিকভাবে (অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র ১৩২৭)। দ্র. *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৪১১।

৩. যেমন 'ওমর খাইয়াম' (মাঘ ১৩২৬), 'পারস্য সাহিত্য' (আষাঢ় ১৩২৭), ' শেখ সাদী' (শ্রাবণ ১৩২৭), 'শক্তিসাধনা' (ভাদ্র ১৩২৮), 'মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী' (অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২৮), 'ইসমাইলী মতবাদ' (আশ্বিন ১৩৩৪), 'নাসির খসরু' (অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩৪), 'মহাকবি আত্তারের শেষ জীবন' (শ্রাবণ ১৩৩৫), 'মহাকবি আত্তারের যুগ' (মাঘ ১৩৩৫), 'ইসলাম ও সভ্যতা' (জৈষ্ঠ ১৩৩৬), 'ইসলাম ও মুক্তবুদ্ধি' (ফাল্গুন ১৩৩৬) প্রভৃতি। দ্র. *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯১-৯২

৪. *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। সতের বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫০) 'মানুষের ধর্ম্ম' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটি তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রূপে সংকলিত হয়– 'অনন্ত তৃষা', 'আদিম প্রেরণা' এবং 'জীবন ও নীতি'। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (১৯৫৯) যুক্ত হয় নতুন তিনটি প্রবন্ধ যার রচনাকাল পঞ্চাশের দশক, অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পরে এগুলি রচিত। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম : 'পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ', বিজ্ঞান যুগে ধর্ম ও সভ্যতা', পারমার্থিক জগৎ ও জীবন'। লেখকের চল্লিশ-পূর্ব জীবনের লেখার সঙ্গে পঞ্চাশ-উর্ধ্ব বয়সের রচনার যে ভিন্নতা সূচিত হয়েছে তা নতুনভাবে সংযোজিত এই তিনটি প্রবন্ধের আলোচনায় স্পষ্ট হবে।

৫. *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনায় মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৮৯। অতঃপর এ-প্রবন্ধে লেখকের সকল বক্তব্যই উদ্ধৃত করা হবে উক্ত গ্রন্থ থেকে এবং উদ্ধৃতির সঙ্গে সংক্ষেপে শুধু ব. র. ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হবে।

৬. আব্দুল হক, 'মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ : দর্শনচর্চা', *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ১০৮

৭. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮

৮. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৯

৯. পূর্বোক্ত, পৃ ১১০

১০. পূর্বোক্ত, পৃ ১১২

১১. আমিনুল ইসলাম, 'মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর দার্শনিক চিন্তা', বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, শরীফ হারুন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৪, পৃ ৫২৮-২৯।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ ৫২৬

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৫২৯। প্রায় অনুরূপ বক্তব্য সমালোচক হাবিবুর রহমানের। তিনি 'মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ : জীবন ও সাহিত্য', শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন : .... তাঁর দর্শন আলোচনা সর্বদা ও সর্বথা যৌক্তিক হতে পারেনি। এমনকি অনেক সময় স্ববিরোধী উক্তিও তিনি করেছেন। তবে একথা বলা যাবে পারতপক্ষে তিনি যুক্তিকে অস্বীকার করতে চাননি।" *একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৯, পৃ ৪৯।

১৪. *পারস্য প্রতিভা* (১ম খণ্ড: ১৯২৪, ২য় খণ্ড: ১৯৩২) ও *মানুষের ধর্ম* (১৯৩৪) এ দুটি গ্রন্থের পর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাঁর আরও চারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থগুলি হলো : *কারবালা* (১৯৫৭), *নবীগৃহ সংবাদ* (মক্কা খণ্ড) (১৯৬০), *নয়া জাতি স্রষ্টা হজরত মুহম্মদ* (১৯৬৩) ও *হজরত ওসমান* (১৯৬৯)।